।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।।

প্রথম অধ্যায় গীতার প্রবেশিকা মাত্র, সাধনারম্ভে পথিকের যেগুলি সমস্যা বলে বোধ হয় তাতে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এখানে সংশয়ের পাত্র কেবল অর্জুন। অনুরাগই অর্জুন। ইষ্টের প্রতি অনুরাগই পথিককে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষের জন্য প্রেরণা প্রদান করে। অনুরাগ আরম্ভিক স্তর। পূজ্য মহারাজজী বলতেন—"সদ্‌গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও যদি অন্তরাত্মায় গ্লানি বোধ, অশ্রুপাত হয়, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তবে জানবে যে এই স্থান থেকেই ভজনা আরম্ভ হল।" অনুরাগের মধ্যেই সবকিছু এসে যায়। এরই মধ্যে সকল ধর্ম, নিয়ম, সৎসঙ্গ, ভাব সবকিছু বিদ্যমান।

অনুরাগের প্রথম পর্বে পারিবারিক মোহ বাধক হয়। প্রথমে সকলেই চান যে আমিও পরমসত্য লাভ করি, কিন্তু এই পথে এগিয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারেন যে এই মধুর পারিবারিক সম্বন্ধ উচ্ছেদ করতে হবে, তখন হতাশ হয়ে পড়েন। সমাজে প্রচলিত যা কিছু ধর্ম-কর্ম বলে মেনে চলতেন, তাতেই সন্তুষ্ট হন। নিজের মোহের পুষ্টির জন্য তিনি প্রচলিত কুরীতির প্রমাণও প্রস্তুত করেন, যেমন অর্জুন বললেন যে কুলধর্ম সনাতন, যুদ্ধে সনাতন ধর্ম লোপ পাবে, কুলক্ষয় হবে, স্বেচ্ছাচার বৃদ্ধি পাবে। এই বক্তব্য অর্জুনের ছিল না, বরং সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসার পূর্বে যে কুরীতি মেনে চলতেন শুধু তাই ছিল।

এইসব কুপ্রথায় জড়িত মানুষ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়, ছোট-বড় দল এবং অসংখ্য জাতির সৃষ্টি করেছে। কেউ নাক চেপে ধরে, কেউ বা কানের লতি চিরে নেয়। আবার কাউকে ছুঁলে জাত যায়, কোথাও রুটি-জলে ধর্ম নষ্ট হয়। তবে কি অস্পৃশ্য অথবা স্পর্শকারীর দোষ? কখনই না, দোষ আমাদের সমাজের ভ্রমদাতাদের। ধর্মের নামে আমরা কুরীতির শিকার হয়েছি, কাজেই দোষ আমাদের।

মহাত্মা বুদ্ধের সময় কেশ-কম্বল নামে এক সম্প্রদায় ছিল। সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা কেশ বড় করে কম্বলের মত প্রয়োগ করাকেই পূর্ণতার মানদণ্ড বলে মনে করত। কেউ গোব্রতিক (গাভীর মত পশুবৎ জীবনযাপন করত) ছিল, কেউ কুকুরব্রতিক (কুকুরের মত খাওয়া-দাওয়া, থাকা) ছিল। ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে এই সকলের কোন সম্বন্ধ নেই। এই সম্প্রদায় এবং সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা পূর্বেও ছিল, আজও আছে। ঠিক এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের সময়ও বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং কুরীতি প্রচলিত ছিল। যার মধ্যে দু একটি কুরীতির শিকার অর্জুনও হয়েছিলেন। তিনি চারটি তর্ক প্রস্তুত করলেন–(১) এই যুদ্ধে সনাতন ধর্ম নষ্ট হবে, (২) বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে, (৩) পিণ্ডোদক ক্রিয়া লোপ পাবে এবং (৪) আমরা কুলক্ষয়ে যে মহাপাপ হয়, সেই পাপ করবার জন্য উদ্যত হয়েছি। এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।। ১।।

করুণাব্যাপ্ত, অশ্রুপূর্ণ ব্যাকুল নেত্রযুক্ত অর্জুনকে ভগবান মধুসূদন (মদ-বিনাশক ভগবান) এই কথা বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।

অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।। ২।।

অর্জুন ! এই বিষমস্থলে তোমার এই অজ্ঞান কেথেকে এল ? বিষমস্থল অর্থাৎ সৃষ্টিতে যার সমতার স্থান কোন নেই, পারলৌকিক যার লক্ষ্য, সেই নির্বিবাদ স্থলে কোন কারণে তোমার অজ্ঞান উৎপন্ন হল ? এই অজ্ঞান কেন ? অর্জুন তো সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্যই এখানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য প্রাণপণে তৎপর হওয়া কি অজ্ঞান ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হ্যাঁ, এটা অজ্ঞান। তা'না হলে অতীতে কোন না কোন শ্রেষ্ঠ মনীষী অবশ্যই এর আচরণ করতেন। তাই এই কর্ম স্বর্গও দিতে পারে না, কীর্ত্তিও বৃদ্ধি করতে অসমর্থ। যিনি সৎপথে চলেন, তিনিই আর্য। গীতা

আর্য-সংহিতা পরিবারের জন্য নষ্ট হওয়া যদি অজ্ঞানতা না হত, তবে মহাপুরুষগণ অবশ্যই সেই পথে অনুগমন করতেন। যদি কুলধর্মই সত্য হত, তাহলে স্বর্গ ও কল্যাণের শ্রেণীভাগ অবশ্যই হত। এটা কীর্ত্তিদায়কও নয়। মীরা ভজন করতে শুরু করলেন তখন **'লোগ কহে মীরা ভই বাওরী, সাস কহে কুলনাশী রে।'** কিন্তু যে পরিবার কুল ও মর্যাদার রক্ষার জন্য মীরার শাশুড়ী বিলাপ করছিলেন, আজ সেই কুলবতী শাশুড়ীকে কেউ জানে না, মীরাকে বিশ্ব জানে। ঠিক তেমনিই যারা পরিবারের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাদেরও কীর্ত্তি কতদিনের জন্য স্থায়ী? যেখানে কীর্ত্তি নেই, কল্যাণ নেই এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যার আচরণ করেননি, তবেই একথা প্রমাণিত হল যে তা অজ্ঞান। অতএব–

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। ৩।।

হে অর্জুন! ক্লীবভাব আশ্রয় করো না। তাহলে কি অর্জুন নপুংসক ছিলেন? আপনি কি পুরুষ? যে পৌরুষহীন সেই নপুংসক। সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে পুরুষার্থ করে। কৃষক রাত-দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেত-এ পুরুষার্থ করে। কেউ ব্যবসা বাণিজ্যকে পুরুষার্থ বলে মনে করে, কেউ পদের অপব্যবহার করে পুরুষার্থী হয়। সারাজীবন পুরুষার্থ করেও অবশেষে শুধু হাতে যেতে হয়। তাহলে এই কথা স্পষ্ট হল যে এই কার্যগুলি পুরুষার্থ নয়। শুদ্ধ পুরুষার্থ 'আত্মদর্শন'। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেছিলেন–

নপুংসক পুমান্ জ্ঞেয়ো যো ন বেত্তি হৃদি স্থিতম্।

পুরুষং স্বপ্রকাশং তস্মানন্দাত্মানমব্যয়ম্।। (আত্মপুরাণ)

"সেই ব্যক্তি পুরুষ হয়েও নপুংসক, যে হৃদয়স্থ আত্মাকে জানে না। সেই আত্মাই পুরুষস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, উত্তম আনন্দময় এবং অব্যক্ত। সেই আত্মাকে জানার প্রয়াসই পৌরুষ।" তাই হে অর্জুন! তুমি ক্লীবভাব আশ্রয় করো না। এইরূপ ভাব তোমার শোভা পায় না। হে পরন্তপ! হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আসক্তি ত্যাগ কর। এটা হৃদয়ের দুর্বলতা। তখন অর্জুন তৃতীয় প্রশ্ন করলেন–

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সঙ্খ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতি যোৎস্যামি পূজার্হাববরিসূদন।। ৪।।

অহঙ্কার শমনকারী মধুসূদন! আমি রণভূমিতে পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণের সঙ্গে বাণের দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করব? কারণ হে অরিসূদন! এঁরা দুইজনেই পূজনীয়।

দ্বৈতই দ্রোণ। প্রভু ভিন্ন, আমি ভিন্ন—দ্বৈতের এই বোধই প্রাপ্তির প্রেরণার আরম্ভিক স্রোত। এটাই দ্রোণাচার্যের গুরুত্ব। ভ্রমই ভীষ্ম। যতক্ষণ ভ্রম বিদ্যমান, ততক্ষণ সন্তান, পরিবার, আত্মীয় সকলেই নিজের বলে মনে হয়। ভ্রমের জন্যই নিজের বলে বোধ হয়। আত্মা এঁদেরই পূজ্য বলে মনে করে, এঁদের সঙ্গে থাকে যে ইনি পিতা, ইনি ঠাকুরদা, কুলগুরু ইত্যাদি। সাধনা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন '**গুরু ন চেলা পুরুষ অকেলা**'।

ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ।

চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।। (আত্মষটক, ৫)

যখন চিত্ত পরম আনন্দে বিলীন হয়, তখন গুরু জ্ঞানাদাতা থাকেন না ও শিষ্যও গ্রহণকর্ত্তারূপে থাকে না। এটাই পরমস্থিতি। গুরুর গুরুত্ব লাভ করার পর গুরু শিষ্য একাকার হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন! তুমি আমাতে নিবাস করবে।' এখানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের, পরে সেইরূপই লাভ করবেন অর্জুন এবং ঠিক তেমনিই স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ হন। এরূপ অবস্থাতে গুরুর গুরুত্ব বিলীন হয়ে যায়, ও সেই গুরুত্ব শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চার হয়। অর্জুন গুরুপদের দোহাই দিয়ে এই সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তিনি বলছেন—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।। ৫।।

এই মহানুভব গুরুজনদের বধ না করে ইহজগতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করলেও আমার কল্যাণ হবে বলে মনে করি। এখানে ভিক্ষার অর্থ ভরণ-পোষণের জন্য ভিক্ষা করা নয়; বরং সৎপুরুষের যথাসাধ্য সেবা করে, তাঁর কাছ থেকে কল্যাণের প্রার্থনা করাই ভিক্ষা। **'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' (তৈত্তিরীয় উপ. ২/১)** অন্নই একমাত্র পরমাত্মা, যা গ্রহণ করে আত্মা সর্বদার জন্য তৃপ্ত হয়ে যায়, আর কখনও অতৃপ্ত হয় না। আমরা মহাপুরুষের সেবা ও যাচনাদ্বারা ধীরে ধীরে ব্রহ্মপীযুষ পান করতে চাই, কিন্তু এই পরিবার যাতে ত্যাগ করতে না হয়, এখানে এই ছিল অর্জুনের ভিক্ষান্নের কামনা। সংসারের অধিকাংশ লোকে এই রকমই করে। তারা চায় যে, পারিবারিক স্নেহসম্বন্ধ অটুট থাকুক ও মুক্তির পথও ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতে থাক। সাধনা পথের পথিক যিনি, যাঁর সংস্কার এদের চেয়ে উন্নত, যাঁর মধ্যে সংঘর্ষ করার ক্ষমতা আছে, স্বভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব বিরাজিত, তাঁর জন্য এই ভিক্ষান্নের বিধান নেই। নিজের ক্ষমতা অনুসারে কিছু না করে, যাচনা করাই ভিক্ষা। গৌতম বুদ্ধ তাঁর মজ্ঝিম নিকায়ের ধম্মদায়াদসুত্ত (১/১/৩) এতে এই ভিক্ষান্নকে আমিষ দায়াদ বলে হেয় করেছেন। যদিও জীবনযাপন তাঁরা ভিক্ষুর মতই করতেন।

এই গুরুজনদের বধ করে কি লাভ হবে? এই লোকে রুধিরাক্ত অর্থ ও কামনার জন্য যে ভোগ, সেই ভোগের বাসনাই পূরণ হবে। অর্জুন ভেবেছিলেন ভজন করলে ভৌতিক সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এরূপ কঠিন সংঘর্ষ করার পরও শরীরের পোষক অর্থ ও কামনার যে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী সেগুলিই তো ভোগ করার জন্য লাভ হবে। পুনরায় তিনি তর্কের অবতারণা করলেন–

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।। ৬।।

এও নিশ্চিত নয় যে সেই ভোগলাভ হবেই। এও জানি না যে আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয়স্কর; কারণ এপর্যন্ত আমি যা কিছু বলেছি সে সমস্ত অজ্ঞান বলে প্রমাণিত হয়েছে। এও জানি না যে আমরা জয়লাভ করব অথবা তারা করবে? তাদের বধ করে আমি বেঁচে থাকতে চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমার সম্মুখে

দণ্ডায়মান। অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র থেকে উৎপন্ন মোহ ইত্যাদি স্বজন সমুদায় ধ্বংসই যখন হয়ে যাবে, তখন আমি বেঁচেই বা কি করব? অর্জুন পুনরায় ভেবে দেখলেন যে, যা কিছু তিনি বলছেন হতে পারে তাও অজ্ঞান, তাই তিনি প্রার্থনা করলেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। ৭।।

কাপুরুষতা দোষে স্বভাব অভিভূত হয়েছে ও ধর্মবিষয়ে আমার চিত্ত বিমূঢ় হয়েছে। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার পক্ষে যা কল্যাণকর তা নিশ্চয়পূর্বক বলুন। কারণ আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমার মঙ্গল করুন। শুধু শিক্ষা নয়, পথভ্রান্ত হলে রক্ষা করুন। "লাদ দে লদায় দে, অওর লদানেওয়ালা সাথ চলে—কখনও বোঝা পড়ে গেলে, তা ওঠাবে কে।" অর্জুনের সমর্পণ এই ধরণের ছিল।

এখানে অর্জুন পূর্ণ সমর্পণ করে দিলেন। এপর্যন্ত তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের স্তরেরই মনে করেছিলেন, কিছু কিছু বিদ্যাতে নিজেকে শ্রেষ্ঠই ভেবেছিলেন। এখানে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শ্রীকৃষ্ণের হাতেই তুলে দিলেন। সদ্‌গুরু সাধনের শেষ অবস্থা পর্যন্ত হৃদয়ে স্থিত থেকে সাধকের সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যদি তিনি সঙ্গে না থাকেন, তবে সাধকের পক্ষে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। পিতা-মাতা যেমন কন্যার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সংযমের শিক্ষা দিয়ে তার সংরক্ষণ করেন, তদ্রূপ সদ্‌গুরু নিজের শিষ্যকে অন্তরাত্মা থেকে সারথী হয়ে, প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত করে দেন। এখানে অর্জুন নিবেদন করলেন যে ভগবন্! আর একটা কথা—

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।

অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।। ৮।।

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক ধনধান্যসম্পন্ন রাজ্য এবং দেবতাগণের অধিপতি ইন্দ্রপদ লাভ হলেও আমার ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপক শোক নিবারণ করতে পারে এমন কোনও উপায় দেখছি না। যখন শোক বিদ্যমান, তখন এই সমস্ত সম্পদ্ নিয়ে আমি কি করব? যদি এই মাত্র লাভ হবে, তবে ক্ষমা করুন। অর্জুন চিন্তা করলেন যে এর থেকে বেশী বলবেনই বা কি?

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুডাকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।। ৯।।

সঞ্জয় বললেন— হে রাজন্! মোহনিদ্রাজয়ী অর্জুন হৃদয়ের সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলবার পর 'আমি যুদ্ধ করব না' বলে নীরব হলেন। এপর্যন্ত অর্জুনের দৃষ্টি পৌরানিকই ছিল, যাতে কর্মকাণ্ড সমাপনের পর ভোগোপলব্ধির বিধান বিদ্যমান, যেখানে স্বর্গকেই সবকিছু বলে স্বীকার করা হয়েছে— যার উপর শ্রীকৃষ্ণ আলোকপাত করবেন যে, এ বিচারধারাও ভুল।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।। ১০।।

তদনন্তর হে রাজন্! অন্তর্যামী যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদলের মধ্যে শোকাতুর অর্জুনকে হেসে এই কথা বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। ১১।।

অর্জুন! যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য তুমি শোক করছ, এবং পণ্ডিতের মত কথা বলছ; কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কা'রও জন্য শোক করেন না, কারণ তাদেরও একদিন মৃত্যু হবে। তুমি কেবল পণ্ডিতদের মত কথাই বল, বস্তুতঃ জ্ঞাতা নও, কেননা—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্।। ১২।।

একথাও নয় যে আমি অর্থাৎ সদ্‌গুরু কোনও কালে ছিলাম না এমন নয়, তুমি অর্থাৎ অনুরাগী অধিকারী কখনও ছিলে না তাও নয়, বা '**জনাধিপাঃ**'– এই রাজাগণ অর্থাৎ রাজসিক বৃত্তিতে যে অহংকার পাওয়া যায়, তা ছিল না, এবং একথাও নয় যে ভবিষ্যতে আমরা কেউ থাকব না। সদ্‌গুরু সর্বদাই থাকেন ও অনুরাগীও সর্বদা থাকে। এখানে যোগেশ্বর যোগের অনন্ততার উপর আলোকপাত করে ভবিষ্যতেও এর বিদ্যমানতার উপর জোর দিলেন। মরণধর্মাদের জন্য শোক না করার কারণ দেখিয়ে আরও বললেন—

দেহিনোহস্মিন্যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।। ১৩।।

যেমন জীবাত্মার এই দেহে কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা ক্রমে উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিতে ধীর পুরুষ মুগ্ধ হন না। কখনও আপনি বালক ছিলেন, ক্রমে যুবক হলেন; কিন্তু এর জন্য আপনার মৃত্যু তো হয়নি? আবার একদিন বৃদ্ধ হলেন। পুরুষ একটাই, তেমনি নতুন দেহ প্রাপ্তিতে কোন বাধা নেই। দেহের এই পরিবর্ত্তন ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ এই পরিবর্ত্তনের অতীত কোন বস্তুলাভ না হয়।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।। ১৪।।

হে কুন্তীপুত্র! সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হেতু অনুভূত হয়, তাই ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য। অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি এদের ত্যাগ কর।

অর্জুন ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগজনিত সুখের স্মরণ করেই ব্যাকুল হচ্ছিলেন। কুলধর্ম, কুলগুরুর পূজ্যতা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও এর অন্তর্গত। এসমস্তই ক্ষণিক, মিথ্যা ও নাশবান্। বিষয়ের সংযোগ সর্বদা পাওয়া যায় না ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও সর্বদা একরকম থাকে না। অতএব অর্জুন! তুমি এদের পরিত্যাগ কর ও অপ্রতিকারপূর্বক সহ্য কর। কেন? সেই যুদ্ধ স্থল কি হিমালয়ের ঠাণ্ডা প্রদেশে ছিল, যার জন্য অর্জুনকে ঠাণ্ডা সহ্য করতে হবে? অথবা মরুভূমির গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল ছিল, যার জন্য গরম সহ্য করতে হবে? কুরুক্ষেত্রকে লোকে

সমশীতোষ্ণ অঞ্চল বলে। মাত্র আঠারো দিন যুদ্ধ হয়েছিল, এরই মধ্যে শীত-গ্রীষ্ম পার হয়ে গিয়েছিল? বস্তুতঃ শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমান সহ্য করা একজন যোগীর উপর নির্ভর করে। এটা হৃদয়-ক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা, বহির্জগতের যুদ্ধের সম্বন্ধে গীতা বলেনি। গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে আসুরী প্রবৃত্তিগুলিকে শান্ত করে পরমাত্মায় স্থিতি প্রদান করে দৈবী সম্পদও শান্ত হয়ে যায়। যখন কোন বিকার থাকে না, তখন সজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহ কার উপর আক্রমণ করবে? অতএব স্থিতি লাভের সঙ্গে তারাও শান্ত হয়ে যায়, এর পূর্বে নয়। গীতাতে অন্তর্দেশের যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। এই ত্যাগে কি লাভ? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।। ১৫।।

কারণ, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখ-দুঃখে অবিচলিত সেই ধীর পুরুষকে ইন্দ্রিয়সমূহ ও বিষয়গুলির সংযোগ ব্যথিত করতে পারে না, তিনিই মৃত্যুর অতীত অমৃত-তত্ত্বলাভের প্রকৃত অধিকারী। এখানে শ্রীকৃষ্ণ একটি উপলব্ধি 'অমৃত'-এর নাম উল্লেখ করলেন। অর্জুন ভেবেছিলেন যুদ্ধের পরিণামে স্বর্গ অথবা পৃথিবী লাভ হবে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন–না স্বর্গলাভ হবে না পৃথিবী, বরং অমৃতলাভ হবে। অমৃত কি?–

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।। ১৬।।

হে অর্জুন! অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই, সেইজন্য ধরে রাখা যেতে পারে না এবং সত্যের তিনকালে অভাব নেই, তা নষ্ট করা যেতে পারে না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি ভগবান তাই কি একথা বলছেন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন–আমি তো বলছিই, উভয়ের পার্থক্য আমার সাথে সাথে অন্যান্য তত্ত্বদর্শীগণও জানেন। যে সত্য তত্ত্বদর্শীগণ জেনেছেন, সেই সত্যই শ্রীকৃষ্ণও পুনরাবৃত্তি করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন যিনি করেন এবং তাঁতে স্থিতিলাভ করেন, তাঁকেই তত্ত্বদর্শী বলে। সৎ ও অসৎ কাকে বলে? এ বিষয়ে বলা হয়েছে–

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎকর্তুমর্হতি ।। ১৭।।

যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তিনিই অবিনাশী। এই **'অব্যয়স্য'**- অবিনাশীর বিনাশ করতে কেউই সমর্থ হয় না;কিন্তু এই অবিনাশী অমৃতের নাম কি? তিনি কে?–

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ।।১৮।।

অবিনাশী, অপ্রমেয় ও নিত্যস্বরূপ আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলে উক্ত হয়েছে। অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। আত্মাই অমৃত। আত্মাই অবিনাশী, যার তিনকালে বিনাশ নেই। আত্মাই সৎ। দেহ নাশবান্, তাই তা অসৎ; ত্রিকালে যার অস্তিত্ব নেই।

'দেহ নশ্বর তাই তুমি যুদ্ধ কর'—এই আদেশে একথা স্পষ্ট হয় না যে, অর্জুন কেবল কৌরবদেরই নিহত করবেন। পাণ্ডব পক্ষেও তো দেহের উপস্থিতিই ছিল, পাণ্ডবগণের দেহ কি অবিনাশী ছিল? যদি দেহ নাশবান্, তবে শ্রীকৃষ্ণ কার রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন? তবে কি অর্জুন কোন দেহধারী ছিলেন? দেহ যা অসৎ, যার কোন অস্তিত্ব নাই, যাকে ধরে রাখা যায় না, শ্রীকৃষ্ণ কি সেই দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রক্ষাকর্ত্তা হয়েছিলেন? যদি এমনই হয়েছিল, তাহলে তিনিও অবিবেকী ও মূঢ়, কারণ এরপর তিনি নিজেই বলেছেন যে, যারা কেবল আহারের জন্যই জীবন ধারণ, পরিশ্রম করে (৩/১৩) তারা অবিবেকী ও মূঢ়। এইরূপ পাপী পুরুষের বেঁচে থাকাটাই ব্যর্থ। তাহলে অর্জুন কে ছিলেন?

বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন। অনুরাগীর জন্য ইষ্ট সবর্দা সারথী হয়ে সঙ্গে থাকেন। বন্ধুর মত পথ দেখান। আপনি দেহ নন। দেহটা আবরণ মাত্র, বাসস্থান। অনুরাগপূর্ণ আত্মাই এতে বাস করেন। ভৌতিক যুদ্ধে, হত্যাকাণ্ডে শরীরান্ত হয় না। এই দেহ ত্যাগ করলে আত্মা অন্য দেহ ধারণ করে নেবে। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন যে, যেভাবে বাল্যকাল থেকে যুবা বা বৃদ্ধাবস্থা আসে, ঠিক সেইভাবেই দেহান্তর ঘটে। শরীর বধ করলে জীবাত্মা নতুন বস্ত্র পরিবর্তন করে নেবে।

দেহ সংস্কারের উপর আশ্রিত ও সংস্কার মনের উপর আধারিত। **'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।' (পঞ্চদশী, ৫/৬০)** এই মনকে শান্ত রাখা, অচল স্থির অবস্থান করা এবং অন্তিম সংস্কারের বিলয় হওয়া একই ক্রিয়া। সংস্কারের স্তর নিঃশেষ হওয়াই শরীরের অন্ত বা শেষ। এর বিলয়ের জন্য আপনাকে আরাধনা করতে হবে, যাকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম অথবা নিষ্কাম কর্মযোগের নাম দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন; কিন্তু এর একটা শ্লোকও জাগতিক যুদ্ধ অথবা হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করে না। এই যুদ্ধ সজাতীয়-বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলির যুদ্ধ, যা অন্তর্দেশে ঘটে থাকে।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।। ১৯।।

যিনি এই আত্মাকে হন্তা বলে মনে করেন এবং যিনি এই আত্মাকে মৃত বলে মনে করেন, তাঁরা উভয়েই আত্মাকে জানেন না; কারণ এই আত্মা কাউকে হত্যা করেন না এবং কারও দ্বারা নিহতও হন না। পুনরায় এই বিষয়ের উপর জোর দিলেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। ২০।।

এই আত্মা কোন কালে জাত বা মৃত হন না; কারণ বস্ত্র পরিবর্তন করে নেন। আত্মা হয়ে অন্য কিছুতে পরিবর্তনও হয় না; কারণ এই আত্মা অজন্মা, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাতন। দেহনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মাই সত্য ও আত্মাই পুরাতন। আত্মাই শাশ্বত ও আত্মাই সনাতন। আপনি কে? সনাতন ধর্মের উপাসক। সনাতন কে? আত্মা। আপনি আত্মার উপাসক। আত্মা, পরআত্মা, ব্রহ্ম একে অন্যের পর্যায়। আপনি কে? শাশ্বত ধর্মের উপাসক। শাশ্বত কে? আত্মা। অর্থাৎ আমি ও আপনি আত্মার উপাসক। যদি আপনি আত্মিক পথটি না ধরেছেন, তাহলে আপনার কাছে শাশ্বত সনাতন নামের কোন বস্তু নেই। যদি আপনি সেই পথে চলবার জন্য

ব্যাকুল, তবে আপনি প্রত্যাশী অবশ্যই; কিন্তু সনাতনধর্মী নন। আপনি সনাতন ধর্মের নামে কোন কুরীতির শিকার হয়েছেন।

দেশ-বিদেশে মানুষ মাত্রেরই আত্মা এক সমান। সেই জন্য বিশ্বে কোথাও কোন ব্যক্তি যদি আত্মাতে স্থিত হওয়ার ক্রিয়া জানেন ও সেই পথে চলবার জন্য প্রযত্নশীল, তাহলে তিনি সনাতনধর্মী; তাতে তিনি নিজেকে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী যা কিছুই বলুন না কেন।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ।। ২১।।

পার্থিব দেহকে রথ করে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যতে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী পৃথাপুত্র অর্জুন! যে পুরুষ এই আত্মাকে নাশরহিত, নিত্য, অজন্মা ও অব্যক্ত বলে জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কার হত্যা করেন এবং কারও হত্যা করান? অবিনাশীর বিনাশ অসম্ভব। অজন্মা জন্ম গ্রহণ করেন না। অতএব দেহের জন্য শোক করা উচিত নয়। একথা উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করলেন–

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। ২২।।

মানুষ যেমন **'জীর্ণানি বাসাংসি'**-জীর্ণ-শীর্ণ পুরোনো বস্ত্রগুলি ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা পুরোনো শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর গ্রহণ করে। জীর্ণ হওয়ার পরই যদি নতুন শরীর ধারণ করা হয়ে থাকে, তাহলে শিশু কেন মরে? এই শরীরের আরও বিকাশ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ শরীর সংস্কারের উপর আধারিত। যখন সংস্কার জীর্ণ হয়, তখনই আমরা দেহত্যাগ করি, যদি সংস্কার দুদিনের, তাহলে দ্বিতীয় দিনই শরীর জীর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মানুষ একটা শ্বাসও বেশী নিতে পারে না। সংস্কারই শরীর। আত্মা সংস্কার অনুযায়ী নতুন শরীর ধারণ করে থাকে– **'অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথা ইহৈব তথৈব প্রেত্য ভবতি। কৃতং লোকং পুরুষোঽভিজায়তে।' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩/১৪)** অর্থাৎ এই পুরুষ অবশ্যই সংকল্পময়। এই লোকে পুরুষ যেমন নিশ্চয়যুক্ত হয়, মৃত্যুর পর তেমনিই তার অবস্থা

হয়ে থাকে। নিজের সংকল্পের দ্বারা তৈরী শরীরে পুরুষের সৃষ্টি হয়। এইরূপ মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র, আত্মা মরে না। পুনরায় এর অজরতা-অমরতার উপর জোর দিলেন–

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। ২৩।।

অর্জুন! এই আত্মাকে কোন শস্ত্র ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, জল একে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।। ২৪।।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য–একে ছেদন করা যেতে পারে না। এই আত্মা অদাহ্য–একে দহন করা যেতে পারে না। অক্লেদ্য–একে আর্দ্র করা যেতে পারে না। আকাশ একে নিজের মধ্যে সমাহিত করতে পারে না। নিঃসন্দেহে এই আত্মা অশোষ্য, সর্বব্যাপক, অচল, স্থির এবং সনাতন।

অর্জুন বলেছিলেন যে, কুলধর্ম সনাতন, এই যুদ্ধে সনাতন ধর্মলোপ পাবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একে অজ্ঞান বললেন এবং আত্মাকে সনাতন বললেন। আপনি কে? সনাতন ধর্মের অনুযায়ী। সনাতন কে? আত্মা। যদি আপনি আত্মাকে উপলব্ধি করবার বিধি-বিশেষ সম্বন্ধে অবগত নন, তাহলে সনাতন ধর্ম কি তা আপনি জানেন না। এর কুপরিণাম সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডিতে বদ্ধ ধর্মভীরু লোকেদের ভোগ করতে হয়। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে মুসলমানেরা এসেছিল মাত্র বারো হাজার, বর্তমানে তাদের সংখ্যা আঠাশ কোটি। বারো হাজার থেকে লক্ষাধিক হত, তার বেশী হলে কোটির কাছাকাছি হত আর কত হত? এরা আজ আঠাশ কোটির থেকেও বেশী হতে চলেছে। সকলেই হিন্দু, আপনার নিজের ভাই সবাই, যারা ছুতমার্গ অবলম্বন করার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। তারা নষ্ট হয়নি, তাদের সনাতন, অপরিবর্তনশীল ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে।

যখন ম্যাটার (Matter) ক্ষেত্রের কোন বস্তু এই সনাতনকে স্পর্শ করতে পারে না, তখন ছোঁয়া-খাওয়ায় এই সনাতন ধর্ম কিভাবে নষ্ট হবে? এটা ধর্ম নয়,

কুরীতির পরিস্থিতি ছিল। যার ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের বৃদ্ধি হয়েছে, দেশ বিভাজন হয়েছে ও রাষ্ট্রীয় একতা আজও একটি সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই সকল কুরীতির কাহিনীতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। হামীরপুর জেলাতে ৫০-৬০টি পরিবার কুলীন ক্ষত্রিয় ছিল। আজ তারা সকলেই মুসলমান। না তাদের উপর গোলা-বারুদের হামলা হয়েছিল, না তরবারির। তাহলে কি হয়েছিল? একরাতে ১-২ জন মৌলবী সেই গ্রামের একমাত্র কুয়োর কাছেই লুকিয়ে ছিল, কারণ, কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথম এখানেই স্নান করতে আসবেন। যেই তিনি এসেছিলেন, অমনি তাঁকে সেই মৌলবীরা ধরে তাঁর মুখবন্ধ করে দিয়েছিল। তাঁর সামনেই তারা কুয়ো থেকে জল তুলে কিছুটা জল পানকরে বাকী উচ্ছিষ্ট জলটুকুর সঙ্গে এক টুকরো রুটিও তাতে ফেলে দিয়েছিল। পণ্ডিতমশাই নিরুপায় হয়ে তাদের দেখতেই থেকে গিয়েছিলেন, তারপরে তারা পণ্ডিতমশাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছিল এবং তাঁকে নিজেদের ঘরে বন্ধ করে দিয়েছিল।

পরের দিন তারা হাতজোড় করে পণ্ডিত মশাইকে ভোজনের জন্য নিবেদন করাতে তিনি রেগে বলেছিলেন- "তোমরা যবন আর আমি ব্রাহ্মণ, আমি কি করে এই ভোজন গ্রহণ করব?" মৌলবীরা তখন বলেছিল যে- "মহারাজ! আপনার মত বিচারবান্ লোকদের আমাদের বড়ই দরকার, ক্ষমা করবেন।" এর পর পণ্ডিতমশাইকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল।

পণ্ডিতমশাই নিজের গ্রামে ফিরে দেখেছিলেন যে লোকে কুয়োর জল আগেকার মতই ব্যবহার করে চলেছে, তিনি তা দেখে অনশন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। কিছু লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন—যবনরা এই কুয়োর পাড়ে চড়েছিল, আমার সামনেই তারা এর জল উচ্ছিষ্ট করেছে এর মধ্যে রুটিও ফেলেছে, একথা শুনে গ্রামের লোকেরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, "এখন কি হবে?" পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন—"কি আর হবে? ধর্ম তো নষ্টই হয়ে গেছে।"

সেই সময় সেই গ্রামের লোকেরা অশিক্ষিত ছিল। স্ত্রী ও শূদ্রের কাছ থেকে পড়ার অধিকার বহু আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বৈশ্য ধন উপার্জনকেই নিজেদের ধর্ম বলে মনে করত। ক্ষত্রিয় চারণগণের প্রশস্তি গানেই মগ্নছিল— অন্নদাতার তরবারি

চমকালে, আকাশে বিদ্যুৎ খেলে যেত ও দিল্লীর সিংহাসন টলে উঠত। সম্মান এমনিতেই ছিল তাহলে তারা পড়বে কেন? ধর্মের তাদের কি প্রয়োজন? ধর্ম কেবল ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া বস্তু হয়ে রয়ে গিয়েছিল। তাঁরাই ধর্মসূত্রের রচয়িতা, তাঁরাই এর ব্যাখ্যাকার ও তাঁরাই এর সত্য-মিথ্যার নির্ণায়ক ছিলেন। প্রাচীনকালে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সকলেরই বেদ পড়বার অধিকার ছিল। প্রত্যেক বর্গের ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্রের রচনা করেছিলেন, শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন রাজাগণ ধর্মের নামে যারা আড়ম্বরের বিস্তার করত, তাদের দণ্ড দিয়েছেন, আবার ধর্মপরায়ণদের আদরও দিয়েছেন।

কিন্তু মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের যথার্থ জ্ঞান না থাকার জন্য উক্ত গ্রামের সমস্ত লোকেরা ভেড়ার মত কোনঠাসা হয়ে গিয়েছিল, যে ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু লোক এধরণের অপ্রিয় কথা শুনে আত্মহত্যা করে নিয়েছিল কিন্তু কতদূর সকলেই প্রাণত্যাগ করত? অটুট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে অন্য সমাধান খুঁজতে হয়েছিল। আজও তারা বাঁশ পুঁতে, পেষণদণ্ড (মুগুর) রেখে হিন্দুদের মতই বিবাহ করে; পরে একজন মৌলবী এসে নিকাহ পড়িয়ে চলে যায়। তারা সকলেই শুদ্ধ হিন্দু, কিন্তু এখন সকলেই তারা মুসলমান হয়ে গেছে।

হয়েছিল কি? জল পান করেছিল, না জেনে মুসলমানদের ছোঁয়া খেয়ে ছিল। সেই জন্য ধর্ম নষ্ট হয়ে গেল। ধর্ম না হয়ে লজ্জাবতী লতা হয়ে গেল। লজ্জাবতী লতা এক ধরণের ছোট চারা গাছকে বলে, যার পাতা স্পর্শমাত্র সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আবার হাত সরালেই বিকশিত হয়; কিন্তু ধর্ম এমন লোপ পেল যে, এর আর বিকাশ হল না। একেবারে শেষ হয়ে গেছে, তাদের কৃষ্ণ, রাম ও পরমাত্মা মরে গেছে। যাঁরা শাশ্বত, তাঁরা নেই। বাস্তবে সেটি শাশ্বতের নামে কোন কুরীতি ছিল, যা লোকে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল।

ধর্মের শরণে আমরা যাই কেন? কারণ আমরা মরণধর্মা ও ধর্ম কোন প্রামান্য বস্তু, যার শরণাগত হলে অমরতা লাভ করা যায়। আমরা তো হত্যা করলে মারা যায় আর ধর্ম কি শুধু স্পর্শে এবং আহার গ্রহণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ধর্ম আমাদের রক্ষা কি করে করবে? ধর্ম তো আপনার রক্ষা করে, আপনার চেয়ে শক্তিশালী। আপনি তরবারির আঘাতে মরবেন আর ধর্ম? তা ছোঁয়াতেই নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার ধর্ম কেমন? কুরীতি সকল নষ্ট হয়, সনাতন নয়।

সনাতন যথার্থ হয়, যাকে শস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যেতে পারে না। অগ্নি দাহ করতে পারে না জল আর্দ্র করতে পারে না। খাদ্য-পানীয় দূরে থাক প্রকৃতিজাত কোন বস্তু একে স্পর্শ করতে পারে না, তাহলে সেই সনাতন কি করে নষ্ট হতে পারে?

এই ধরণের কিছু কুরীতি অর্জুনের কালেও ছিল। অর্জুনও তার শিকার হয়েছিলেন। তিনি বিলাপ করে কাতরতার সঙ্গে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন যে, কুলধর্মই সনাতন। যুদ্ধ হলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হবে। কুলধর্ম নষ্ট হবে এবং কুলধর্ম নষ্ট হলে আমরা অনন্তকাল ধরে নরকে বাস করব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"এই অজ্ঞানতা তোমার মধ্যে কোত্থেকে উৎপন্ন হল?" তাহলে প্রমাণিত হল যে, সেসব কুরীতি ছিল, তবেই তো শ্রীকৃষ্ণ তার নিরাকরণ করলেন এবং বললেন আত্মাই সনাতন। যদি আপনি আত্মিক পথ সম্বন্ধে অবগত নন, তবে আপনি এখনও সনাতন ধর্মে প্রবেশ করতে পারেননি।

যখন এই সনাতন-শাশ্বত আত্মা সকলের অন্তরে পরিব্যাপ্ত, তখন কেমন করে খোঁজ করা হবে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।। ২৫।।

এই আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে একে উপলব্ধি করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আত্মা আছে ঠিকই কিন্তু তাকে জানা যায় না। আত্মা অচিন্ত্য। যতক্ষণ চিত্ত ও চিত্তের তরঙ্গ বিদ্যমান, ততক্ষণ সেই শাশ্বত আছে অবশ্যই; কিন্তু আমাদের দর্শন, উপভোগ এবং প্রবেশের জন্য নয়। অতএব চিত্তের নিরোধ আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন যে অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সতের তিনকালে অভাব নেই। সৎ আত্মা। আত্মাই অপরিবর্তনশীল, শাশ্বত, সনাতন ও অব্যক্ত। তত্ত্বদর্শীগণ আত্মাকে এই সকল বিশেষ গুণধর্মেযুক্ত দেখেছেন। দশটি ভাষার বিশারদও দেখেননি ও কোন সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিও দেখেননি; বরং তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—তত্ত্ব হচ্ছেন পরমাত্মা। মনের নিরোধকালে সাধক তাঁর দর্শন করেন এবং তাঁতে স্থিতি লাভ করার অধিকারী হন। প্রাপ্তিকালে

ভগবানকে পাওয়া যায় এবং সাধক পরক্ষণেই নিজের আত্মাকে ঈশ্বরীয় গুণধর্মে বিভূষিত দেখেন। তিনি দেখেন আত্মাই সত্য, সনাতন ও পরিপূর্ণ। এই আত্মা অচিন্ত্য। এই বিকাররহিত অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল। সেইজন্য অর্জুন! আত্মার এই সনাতন স্বরূপ অবগত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর। এবার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বিচারগুলির মধ্যে যে বিরোধাভাস তা দেখালেন—যেটা খুব সামান্য তর্ক।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি।। ২৬।।

যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্যজাত এবং সদা নশ্বর বলে মনে কর, তবুও তোমার শোক করা উচিত নয়; কারণ–

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ২৭।।

এরূপ হলেও জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী একথা প্রমাণিত। সেই জন্য এই অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। যার কোন চিকিৎসা নেই, তার জন্য শোক করা এক অন্য দুঃখকে আমন্ত্রণ করা মাত্র।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।। ২৮।।

অর্জুন! সকল প্রাণী জন্মের পূর্বে দেহহীন এবং মৃত্যুর পরেও দেহহীন অবস্থাতে থাকে, কেবল জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেকার সময়ে এই দেহধারণটা আমরা দেখে থাকি, জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পশ্চাতে কিছুই দেখা যায় না। অতএব এই পরিবর্তনের জন্য চিন্তা করা ব্যর্থ। এই আত্মাকে কে দেখতে সক্ষম? এই প্রসঙ্গে বললেন–

আশ্চর্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।। ২৯।।

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, এই আত্মাকে তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন; এখন তত্ত্বদর্শনের দুর্লভতার উপর আলোকপাত করলেন যে, কোন বিরল মহাপুরুষই এই আত্মাকে আশ্চর্যের মত দেখেন। শোনেন না, প্রত্যক্ষ দেখেন এবং সেইরূপ অন্য কোন মহাপুরুষ সবিস্ময়ে এই তত্ত্ব বর্ণনা করেন। যিনি দেখেছেন তিনিই যথার্থ বলতে পারেন। অন্য কোন বিরল সাধক এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন, সকলে শোনেনও না, কারণ অধিকারী বিশেষে এইভাব বোধগম্য হয়। হে অর্জুন! কেউ কেউ শুনেও এই আত্মাকে জানতে পারে না; কারণ সাধন সম্পূর্ণ হয় না। আপনি হাজার জ্ঞানের কথা শুনুন, সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে বুঝে নিন, আগ্রহী হয়েও থাকুন; কিন্তু মোহ বড়ই প্রবল, অল্পসময়ের মধ্যেই আপনি সাংসারিক ব্যবস্থাতে লিপ্ত হয়ে যাবেন।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ নির্ণয় করলেন—

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎসর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ৩০।।

অর্জুন! প্রাণীগণের দেহে অবস্থিত আত্মা সদা অবধ্য, অকাট্য। সেইজন্য কোন প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়।

'আত্মাই সনাতন'–এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করে, এর প্রভুতার সঙ্গে বর্ণনা করে এই প্রশ্ন এখানেই সম্পূর্ণ করলেন। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, এর প্রাপ্তির উপায় কি? সম্পূর্ণ গীতাতে এর জন্য দুটি পথ বলা হয়েছে প্রথম– 'নিষ্কাম কর্মযোগ', দ্বিতীয়– 'জ্ঞানযোগ' এই দুই মার্গকে অবলম্বন করে যে কর্ম করা হয় তা একই। সেই কর্মের অনিবার্যতার উপর জোর দিয়ে যোগেশ্বর এবার জ্ঞানযোগের বিষয়ে বললেন–

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।। ৩১।।

হে অর্জুন! স্বধর্ম লক্ষ্য করেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়, কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা কল্যাণকর ক্ষত্রিয়ের জন্য আর কিছুই নেই। এই যাবৎ 'আত্মা শাশ্বত', 'আত্মা সনাতন', 'এটাই একমাত্র ধর্ম' বলা হয়েছে। এখন এই স্বধর্ম কি? ধর্ম একমাত্র আত্মা, তাহলে ধর্মাচরণ কি? কারণ আত্মা অচল স্থির। বস্তুতঃ এই আত্মপথে প্রবৃত্ত হবার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্। স্বভাবজাত এই ক্ষমতাকেই স্বধর্ম বলা হয়েছে।

এই একমাত্র সনাতন আত্মিক পথের পথিক সাধকদের মহাপুরুষগণ তাদের স্বভাবজাত ক্ষমতানুযায়ী চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ। সাধনার প্রারম্ভিক অবস্থাতে প্রত্যেক সাধক শূদ্র অর্থাৎ অল্পজ্ঞ হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা ভজনে বসেও সাধক ১০ মিনিটের জন্য একাগ্রচিত্ত হতে পারে না, প্রকৃতির মায়াজাল কেটে উঠতে পারে না। এই অবস্থায় কেবল মহাপুরুষের সেবাদ্বারা স্বভাবে সদ্‌গুণের সঞ্চার হয়, অতএব তখন সাধকের স্থিতি বৈশ্য শ্রেণীর হয়। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। সাধক ধীরে ধীরে-এর সংগ্রহ ও গোপালন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের সুরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে ইন্দ্রিয়ের হিংসা হয় এবং বিবেক-বৈরাগ্যের মাধ্যমে এদের সুরক্ষা হয়; কিন্তু প্রকৃতিকে নির্বীজ করবার ক্ষমতা তার মধ্যে এখনও আসে না। ক্রমশঃ উন্নতি করতে করতে সাধকের অন্তরে ত্রিগুণকে খণ্ডন করবার ক্ষমতা এসে যায়। এই স্তর থেকেই সাধক প্রকৃতি ও তার বিকার সমূহকে বিনষ্ট করার ক্ষমতা লাভ করেন। এইজন্য যুদ্ধ এখান থেকেই শুরু হয়। ক্রমশঃ সাধক সাধনা সম্পূর্ণ করে ব্রাহ্মণত্বে পরিবর্তিত হন। তখন মনকে শান্ত রাখা, ইন্দ্রিয় দমন, চিন্তনের নিরবচ্ছিন্ন ধারা, সরলতা, অনুভব, জ্ঞান ইত্যাদি লক্ষণ সাধকের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়। এদের অনুষ্ঠান করে পথ অতিক্রমণ করে ক্রমশঃ তিনি ব্রাহ্মত্ব লাভ করেন। যেখানে পৌঁছে তিনি ব্রাহ্মণও থাকেন না।

বিদেহ রাজা জনকের সভায় চাক্রায়ণ, উষস্তি, কহোল, আরুণি, উদ্দালক এবং গার্গীর প্রশ্নের সমাধনা করে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন—"যিনি আত্মদর্শী এবং নিজের পূর্ণতা দেখেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। এই আত্মাই লোক-পরলোক ও সমস্ত প্রাণীগণকে অন্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, তারাগণ, অন্তরিক্ষ, আকাশ এবং প্রতিক্ষণ এই আত্মার দ্বারাই অনুশাসিত। এই আত্মা অন্তর্যামী অমৃত। আত্মা অক্ষর, এছাড়া বাকী সবই বিনাশশীল। যে ব্যক্তি এই জগতে এই 'অক্ষর'কে না জেনে হোম করে, তপস্যা করে, হাজার হাজার বছরপর্যন্ত যজ্ঞ করে, তার এই সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি এই অক্ষরকে না জেনে প্রাণত্যাগ করে, তবে সে দয়ার পাত্র ও যিনি এই অক্ষরকে জেনে মৃত্যু বরণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩/৪-৫-৭-৮)।

অর্জুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধকের জন্য যুদ্ধ অপেক্ষা কল্যাণকর আর কোন পথই নেই। প্রশ্ন ওঠে যে, ক্ষত্রিয়

কে? প্রায়ই লোকে এর অর্থ সমাজে জন্ম থেকে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি থেকে বোঝে। এদেরই চারটি বর্ণ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু না, শাস্ত্রকার স্বয়ং বলেছেন ক্ষত্রিয় কে? বর্ণ কি? এখানে তিনি কেবল ক্ষত্রিয়ের নাম নিয়েছেন ও এরপরে ১৮ অধ্যায়পর্যন্ত এই প্রশ্নের সমাধান প্রস্তুত করেছেন যে, বস্তুতঃ এই বর্ণ কি? ও কি ভাবে বর্ণের পরিবর্তন হয়?

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–'**চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টম্**' **(গীতা, ৪/১৩)**– চার বর্ণের সৃষ্টি আমি করেছি। তবে কি মানুষকে আর একজন মানুষ থেকে পৃথক্ করেছেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**।'-গুণের মাধ্যমে কর্মকে চারভাগে বিভক্ত করেছি। এখন দেখতে হবে যে, সেই কর্ম কি, যাকে ভাগ করা হয়েছে? গুণ পরিবর্তনশীল। সাধনার উচিত আচরণদ্বারাই তামসিক থেকে রাজসিক এবং রাজসিক থেকে সাত্ত্বিক গুণে উত্তরণ হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণ স্বভাব হয়ে যায়। সেই সময় সাধকের মধ্যে ব্রহ্মত্ব লাভের সমস্ত যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। বর্ণসম্বন্ধী প্রশ্ন এখান থেকে আরম্ভ করে আঠারো অধ্যায়ে গিয়ে পূর্ণ হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে– '**শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ**।' **(গীতা, ১৮/৪৭)** স্বভাবজাত এই ধর্মে প্রবৃত্ত হবার ক্ষমতা যে স্তরেরেই হোক না কেন তা গুণহীন শূদ্র শ্রেণীরও যদি হয়, তাহলেও পরমকল্যাণ করে; কারণ আপনি ক্রমশঃ সেখান থেকেই উত্থান করবেন। সাধক নিজের থেকে উচ্চস্তরের ব্যক্তির নকল করে নষ্ট হয়ে যায়। অর্জুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধক ছিলেন। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বললেন- অর্জুন! স্বভাব থেকে উৎপন্ন এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার নিজের ক্ষমতা লক্ষ্য করেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। এর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন কল্যাণকর কার্য ক্ষত্রিয়ের জন্য নেই। এরই উপর আলোকপাত করে পুনরায় যোগেশ্বর বললেন–

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।। ৩২।।

পার্থিব দেহকে রথ বানিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী অর্জুন! অনায়াসপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ এই প্রকার যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই লাভ করেন। ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধকের মধ্যে ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকে। তাঁরজন্য স্বর্গদ্বার খোলা থাকে; কেননা দৈবী সম্পদ্ সম্পূর্ণভাবে অর্জিত সেই সাধকের মধ্যে স্বরে বিচরণ করবার ক্ষমতা চলে আসে। একেই বলে উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের

এই যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই লাভ করে থাকেন; কারণ তাদের মধ্যেই এই সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকে।

সংসারে যুদ্ধ হয়েই থাকে। কখনও কখনও বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করে, প্রত্যেক জাতি যুদ্ধ করে; কিন্তু শাশ্বত বিজয় বিজিত ব্যক্তিও লাভ করতে পারে না। এসব পরস্পর বিরোধী মনোভাবের সংঘর্ষ মাত্র। যে যাকে যতটা দমন করে, কালান্তরে তাকেও ততটাই দমিত হতে হয়। এই বিজয় কি ধরণের, যাতে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিস্তেজ করবার শোক থাকছেই, শেষে এই দেহও নষ্ট হয়ে যায়? ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষই বাস্তবিক সংঘর্ষ, এতে একবার জয়লাভ করলে সর্বদার জন্য প্রকৃতির নিরোধ ও পরমপুরুষ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। এই বিজয় এমন, যারপর পরাজয় নেই।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্মংকীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।। ৩৩।।

আর যদি তুমি এই 'ধর্মযুক্ত সংগ্রাম' অর্থাৎ শাশ্বত সনাতন পরমধর্ম পরমাত্মায় স্থিতি লাভ করবার জন্য ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহলে 'স্বধর্ম' অর্থাৎ স্বভাবজাত সংঘর্ষ করবার ক্ষমতা, ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে পাপ অর্থাৎ গমনাগমন ও অপকীর্তি প্রাপ্ত হবে। অপকীর্তির উপর আলোকপাত করলেন—

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।। ৩৪।।

সকলেই বহুকাল ধরে তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করবে। যে মহাত্মাগণ পদচ্যুত হয়েছেন আজও তাদের নাম যেমন–বিশ্বামিত্র, পরাশর, নিমি, শৃঙ্গী ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হয়। বহু সাধক নিজধর্মের বিচার করেন, চিন্তা করেন যে লোকে আমাকে কি বলবে? এই ধরণের ভাবও সাধনায় সহায়ক হয়। এইরূপ চিন্তা সাধনাতে প্রবৃত্ত থাকার প্রেরণা দেয়। কিছু দূরপর্যন্ত এইরূপ ভাব সঙ্গ দেয়। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অপকীর্তি মৃত্যু থেকেও বেশী দুঃখদায়ক।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।

যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।। ৩৫।।

তুমি যাঁদের দৃষ্টিতে সম্মানিত ছিলে সেই মহারথীগণ মনে করবেন যে, তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছ। মহারথী কে? যিনি এই পথে কঠোর পরিশ্রম করে অগ্রসর হন, তিনিই মহারথী। এই প্রকার ততটাই পরিশ্রম করে অবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট করে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুগুলিও মহারথী। যাঁরা তোমাকে সম্মান করতেন যে, এই সাধক প্রশংসনীয়, তুমি তাঁদের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যাবে। এতটাই নয়, বরং–

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।। ৩৬।।

শত্রুগণ তোমার পরাক্রমের নিন্দা করে বহু অকথ্য বচন বলবে। একটা কোন দোষ দেখতে পেলেই তো চারিদিক্ থেকে অজস্র নিন্দা ও নানান দোষারোপ হতে থাকে। অকথ্য কথাও বলে থাকে। এর থেকে বেশী দুঃখ আর কি হতে পারে? অতএব–

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৩৭।।

এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গলাভ করবে; অর্থাৎ শ্বরে বিচরণ করবার ক্ষমতা লাভ করবে। স্বাসের বাইরে প্রকৃতিতে বিচরণ করবার ধারা নিরুদ্ধ হয়ে যাবে। যে দৈবীসম্পদগুলি, পরমদেব পরমাত্মাকে লাভ করতে সাহায্য করে, সেগুলি হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রবাহিত থাকবে অথবা এই সংঘর্ষে জয়লাভ করলে মহামহিম স্থিতি লাভ করবে। অতএব অর্জুন! যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করে উত্থিত হও।

প্রায়ই লোকে এই শ্লোকের অর্থ এই মনে করে যে, এই যুদ্ধে মৃত্যু হলে স্বর্গে যাবে ও জয়লাভ করলে পৃথিবীর ভোগ উপভোগ করবে; কিন্তু আপনার স্মরণ হবে যে, অর্জুন বলেছিলেন–"ভগবন্! শুধু পৃথিবীর নয়, বরং ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য এবং দেবতাদের অধিপতির পদ অর্থাৎ ইন্দ্রপদ লাভ হলেও আমি সেই উপায় দেখছি না, যা আমার ইন্দ্রিয়সমূহের বিষাদ দূর করতে পারে। যদি এই সবই লাভ হবে, তবে হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না।" যদি এর পরেও শ্রীকৃষ্ণ বলতেন যে, অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। জয়লাভ করলে পৃথিবীর ভোগ উপভোগ করবে, পরাজয় হলে স্বর্গে বাস করবে। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ দিচ্ছেনই বা কি? অর্জুন এর থেকে শ্রেষ্ঠ যে সত্য, শ্রেয়-র (পরম কল্যাণের) কামনাবিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন, যা সদ্‌গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ

বলেছিলেন যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের এই সংঘর্ষে শরীরের সময় যদি পূর্ণ হয়ে যায় ও লক্ষ্যে পৌঁছান বাকী থাকে, তাহলে স্বর্গলাভ করবে অর্থাৎ স্বরে বিচরণ করবার ক্ষমতা লাভ করবে। দৈবী সম্পদ্ হৃদয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেহের অস্তিত্ব থাকতে থাকতে সংঘর্ষে সফলতা লাভ হলে 'মহীম্'- সব থেকে মহান্ ব্রহ্মের মহিমা উপভোগ করবে, অর্থাৎ মহামহীম স্থিতি লাভ করবে। জয়লাভ করলে সর্বস্ব, কারণ মহামহিমত্ব লাভ করবে ও পরাজয় হলে দেবত্ব- দুইদিক্ থেকেই লাভবান্ হবে। লাভেও লাভ ও লোকসানেও লাভ। পুনরায় এই বিষয়ের উপর জোর দিলেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।। ৩৮।।

এই প্রকার সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। যুদ্ধ করলে প্রত্যবায় তোমার হবে না। অর্থাৎ সুখে সর্বস্ব ও দুঃখেও দেবত্ব লাভ। লাভে মহিমময় স্থিতি অর্থাৎ সর্বস্ব লাভ ও লোকসানে দেবত্ব লাভ। জয়লাভ করলে মহামহিম স্থিতি ও পরাজয় হলে দৈবী সম্পদের উপর অধিকার। এই প্রকার নিজের লাভ-লোকসানের বিচার করে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। যুদ্ধ করলেই এই দুই অবস্থা লাভ হয়। যুদ্ধ করলে পাপ অর্থাৎ আসা-যাওয়া করতে হবে না। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

এষা তেহভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।। ৩৯।।

হে পার্থ! এই বুদ্ধির কথা তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে। কোন্ বুদ্ধির কথা? এই যে, যুদ্ধ কর। জ্ঞানযোগে এই আছে যে, নিজের সামর্থ্য অনুসারে লাভ-লোকসানের ভালভাবে বিচার ক'রে যুদ্ধ কর। জয়লাভ ক'রলে মহামহিম স্থিতি ও পরাজয় হ'লে দেবত্ব লাভ হবে। জয়লাভে সর্বস্ব ও পরাজয়ে দেবত্ব লাভ। দুদিকেই লাভ। যুদ্ধ না করলে সকলেই ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছি বলে মনে করবে, অপকীর্তি হবে। এইরূপ নিজের ক্ষমতা বুঝে, স্বয়ং বিচার করে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া জ্ঞানযোগ।

অধিকাংশ লোকেদের মধ্যে এই ভুল ধারণা দেখা যায় যে, জ্ঞানমার্গে কর্ম (যুদ্ধ) করতে হয় না। তারা বলে যে, জ্ঞানমার্গে কর্ম করবার প্রয়োজন নেই। 'আমি

শুদ্ধ', 'বুদ্ধ', 'চৈতন্য', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', গুণের দ্বারাই গুণ প্রভাবিত, এরূপ মনে করে হাত গুটিয়ে বসে যায়। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এটা জ্ঞানযোগ নয়। জ্ঞানযোগেও সেই কর্ম করতে হয়, যে কর্ম নিষ্কাম কর্মযোগে করা হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল বুদ্ধির অর্থাৎ দৃষ্টিকোণর। জ্ঞানমার্গী নিজের স্থিতি বুঝে, নিজের উপর নির্ভর ক'রে কর্ম করেন। ইষ্টের আশ্রিত হ'য়ে নিষ্কাম কর্মযোগীও সেই কর্মই করেন। উভয় মার্গেই কর্ম করতে হয়, কর্মেও কোনরূপ ভেদ নেই, কেবল কর্ম করবার দৃষ্টিকোণ দুটি।

অর্জুন! এই বুদ্ধিকেই এখন তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুমি কর্ম-বন্ধনের উত্তমরুপে নাশ ক'রবে। এখানে প্রথমবার শ্রীকৃষ্ণ কর্মের নাম নিয়েছেন; কিন্তু কর্ম কি তা বললেন না। এখন কর্মের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করছেন–

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।। ৪০।।

এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের অর্থাৎ বীজের নাশ হয় না। সীমিত ফলরূপ দোষও হয় না, সেই জন্য এই নিষ্কাম কর্মের, এই কর্মদ্বারা সম্পাদিত ধর্মের অতি অল্পও সাধন জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে উদ্ধার করে। আপনি এই কর্ম বুঝে এই পথে দুপা কেবল চলুন (যা সদ্‌গৃহস্থ আশ্রমে থেকেই চলা যেতে পারে, সাধক তো চলেনই) শুধু বীজ বপন করে দিন, তাহলেও সেই বীজের কখনও নাশ হবে না। প্রকৃতির সে ক্ষমতা নেই, এমন কোন অস্ত্র নেই, যা এই সত্যকে মুছে ফেলতে পারে। প্রকৃতি কেবল আবরণ চড়াতে পারে, কিছু বেশী সময় লাগতে পারে; কিন্তু সাধনের আরম্ভ নষ্ট ক'রতে সক্ষম নয়।

আগামী অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, সকল পাপীর থেকেও বেশী পাপী হোক না কেন, জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা নিঃসন্দেহে পার হয়ে যাবে। সেই কথাই এখানে বলছেন– অর্জুন! নিষ্কাম কর্মযোগের শুধু বীজারোপণ করে দিলেও তার নাশ হয় না। বিপরীত ফলরূপ দোষও এতে হয় না যে, আপনাকে স্বর্গ, ঋদ্ধি ও সিদ্ধিপর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছেড়ে দেবে। আপনি এই সাধন ছেড়ে দিলেও, এই সাধন আপনাকে উদ্ধার করেই ছাড়বে। এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পও সাধন জন্ম-মৃত্যুর মহাভয়

থেকে উদ্ধার করে। **'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।'** (৬/৪৫) অর্থাৎ কর্মের এই বীজারোপণ বহু জন্মের পর সেখানেই পৌঁছিয়ে দেবে, যেখানে পরমধাম, পরমগতি হবে। এই প্রসঙ্গে আরও বললেন—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।। ৪১।।

হে অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মযোগে ক্রিয়াত্মক বুদ্ধি একটাই। ক্রিয়া ও পরিণামও একটাই। আত্মিক সম্পত্তিই স্থায়ী সম্পত্তি। প্রকৃতির দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে এই সম্পত্তি ধীরে ধীরে অর্জন করাই ব্যবসা। এই ব্যবসা ও নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়াও একটাই অথবা তাহলে যাঁরা বহু ক্রিয়ার বিস্তার করেছেন, তাঁরা কি ভজন করেন না? শ্রীকৃষ্ণ বললেন-না তারা ভজন করে না। সেই সকল ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট হয় এবং সেইজন্যই অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।। ৪২।।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি।। ৪৩।।

পার্থ! সেই পুরুষগণ **'কামাত্মানঃ'**- কামনাযুক্ত, **'বেদবাদরতাঃ'**- বেদবাক্যে অনুরক্ত, **'স্বর্গপরাঃ'**- স্বর্গকেই চরমলক্ষ্য বলে মনে করেন যে, এর থেকে উত্তম আর কিছু নেই— তাঁরা এইরূপ বিশ্বাস করেন— এই সকল অবিবেকীগণ জন্ম-মৃত্যুরূপ ফলপ্রদানকারী, ভোগ এবং ঐশ্বর্য লাভের জন্য বহু ক্রিয়ার বিস্তার করে থাকেন। আপাতমধুর বাণীদ্বারা ব্যক্তও করেন। অর্থাৎ অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্ত ভেদযুক্ত হয়। তাঁরা ফলপ্রদানকারী বাক্যেই অনুরক্ত থাকেন, বেদ বাক্যকেই প্রমাণ বলে মনে করেন, স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাঁদের বুদ্ধি অনন্ত ভেদযুক্ত হওয়ার ফলে অনন্ত ক্রিয়ার রচনা করে নেন। তাঁরা পরমতত্ত্ব পরমাত্মারই নাম করেন, কিন্তু তার অন্তরালে অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেন। তাহলে কি অনন্ত ক্রিয়াগুলি কর্ম নয়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন-না, এই অনন্ত ক্রিয়াগুলি কর্ম নয়। তাহলে সেই একটিমাত্র নিশ্চিত ক্রিয়া কি? শ্রীকৃষ্ণ এখনও পর্যন্ত তা বলছেন না। এখন এতটাই বলছেন যে, অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখাযুক্ত হওয়ার

ফলে তাঁরা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেন। তাঁরা কেবল যে বিস্তার করেন তা নয়, বরং আলঙ্কারিক শৈলীতে সেসব ব্যক্তও করেন। তার প্রভাব কি হয়?–

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। ৪৪।।

তাঁদের বাণীর প্রভাব যাদের যাদের চিত্তের উপর পড়ে, অর্জুন! তাঁদের বুদ্ধি নাশ হয়। কিছু লাভ করতে পারেন না। সেই বাণী বিমুগ্ধ চিত্ত এবং ভোগ ঐশ্বর্যে আসক্ত সেই পুরুষগণের অন্তঃকরণে ক্রিয়াত্মক বুদ্ধি থাকে না। ইষ্টে সমাধিস্থ হওয়ার নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়া তাঁদের মধ্যে থাকে না।

এই ধরণের অবিবেকীগণের বাণী শোনেন কারা? ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিই শোনেন, অধিকারী শোনেন না। এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে সম ও আদিতত্ত্বে প্রবেশের নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়াসংযুক্ত বুদ্ধি হয় না।

প্রশ্ন ওঠে যে, **'বেদবাদরতাঃ'**- যাঁরা বেদবাক্যে অনুরক্ত তাঁরাও কি ভুল করেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌।। ৪৫।।

অর্জুন! **'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা'**—বেদ ত্রিগুণপর্যন্ত প্রকাশ করে থাকে। এর বেশী কিছু জানে না। সেইজন্য **'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন**।'- অর্জুন! তুমি এই তিনগুণ অতিক্রম করে উপরে ওঠ অর্থাৎ বেদের কার্যক্ষেত্র পার কর। কিরূপে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, **'নির্দ্বন্দ্বঃ'**- সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, নিত্য সত্যবস্তুতে স্থিত হও এবং যোগক্ষেমের আকাঙ্খারহিত আত্মপরায়ণ হও। এইভাবে ঊর্ধ্বে ওঠ। প্রশ্ন ওঠে যে, কেবল আমিই উঠবো অথবা আরও কেউ বেদের ঊর্ধ্বে উঠেছেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যিনি বেদের ঊর্ধ্বে স্থিত তিনি ব্রহ্মকে জানেন এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই বিপ্র।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে।

তাবান্‌সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।। ৪৬।।

পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে মানুষের ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন হয়, যে ব্রাহ্মণ উত্তম প্রকারে ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরও বেদের ততটুকুই প্রয়োজন হয়। তাৎপর্য এই যে, যিনি বেদের ঊর্ধ্বে স্থিত তিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ তুমি বেদের ঊর্ধ্বে ওঠ, ব্রাহ্মণ হও।

অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, ব্রাহ্মণ হও। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণ স্বভাবজাত ক্ষমতাগুলির নাম। এটা কর্মপ্রধান। জন্ম থেকে নির্ধারিত কোন প্রথা নয়। যিনি গঙ্গার নিকটে অবস্থান করেন, তাঁর ক্ষুদ্র জলাশয়ের কি প্রয়োজন? কেউ তাতে শৌচক্রিয়া করে, কেউ পশুদের স্নান করায়। এর বেশী তার প্রয়োজন নেই। এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের, সেই বিপ্র মহাপুরুষের বেদের ততটাই প্রয়োজন থেকে যায়। প্রয়োজন থাকে অবশ্যই; কারন অনুগামীদের জন্য তার উপযোগিতা আছে, সেখান থেকেই চর্চা আরম্ভ হবে। অতপর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করবার সময় যে যে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন, তার প্রতিপাদন করলেন–

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।। ৪৭।।

কেবল কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নেই। এইরূপ চিন্তা কর যে ফলই নেই। ফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়, আবার কর্মে অশ্রদ্ধাও যেন না হয়।

এখন পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঊনচল্লিশতম শ্লোকে প্রথমবার কর্মের নাম নিয়েছেন। কিন্তু বললেন না কর্ম কি এবং সেই কর্মের অনুষ্ঠান কিভাবে করা হবে? সেই কর্মের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করলেন যে—

(১) অর্জুন! এই কর্ম করে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

(২) অর্জুন! এতে আরম্ভের অর্থাৎ বীজের নাশ হয় না। একবার এই কর্ম আরম্ভ করে দিলে, প্রকৃতির সে ক্ষমতা নেই যে একে নষ্ট করতে পারে।

(৩) অর্জুন! এতে সীমিতফলরূপ দোষও হয় না যে স্বর্গ, ঋদ্ধি ও সিদ্ধিতে ভুলিয়ে পথভ্রান্ত করে দেবে।

(৪) এই কর্মের অল্পও অনুষ্ঠান জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে উদ্ধার করে।

কিন্তু এখনও স্পষ্ট করলেন না যে, সেই কর্মটা কি এবং কিরূপে সেই কর্ম সম্পন্ন করা হবে? বর্তমান অধ্যায়ের ৪১তম শ্লোকে তিনি বলেছেন—

(৫) অর্জুন! এতে নিশ্চাত্মক বুদ্ধি একটা। ক্রিয়াও একটাই। তাহলে যাঁরা অনন্ত ক্রিয়ার আচরণ করেন, তাঁরা ভজন করেন না? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—না, তাঁরা ভজন করেন না। এর কারণ দেখিয়ে বললেন যে---অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখাযুক্ত হয় সেইজন্য তাঁরা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেন। তাঁরা সুশোভন বাণী দ্বারা এই ক্রিয়াসমূহকে ব্যক্ত করেন। এবং তাঁদের বাণীর প্রভাব যাঁদের চিত্তের উপর পড়ে, তাঁদের বুদ্ধিও নাশ হয়। অতএব নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়া একটাই। কিন্তু একথা বললেন না যে, সেই ক্রিয়া কি?

প্রস্তুত শ্লোকে তিনি বলছেন—অর্জুন! কর্মে তোমার অধিকার আছে ফলে নেই। ফলের বাসনা কখনও যেন না হয় এবং কর্মেও অশ্রদ্ধা যেন না হয় অর্থাৎ নিরন্তর করবার জন্য মগ্ন হয়ে কর, কিন্তু বললেন না কর্ম কি? প্রায়ই এই শ্লোকের উদাহরণ দিয়ে লোকে বলে যে, যা কিছুই কর না কেন, ফলের কামনা ত্যাগ করে কর, তাহলেই নিষ্কাম কর্মযোগ হবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম কি? তা না বলে কেবল কর্মের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করলেন যে, সেই কর্ম কি কি প্রদান করে এবং কর্ম করবার সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা হয়? প্রশ্নটি যেমনের তেমনি রয়ে গেল, যা শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট করবেন।

পুনরায় এই বিষয়ের উপর জোর দিলেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।। ৪৮।।

ধনঞ্জয়! আসক্তি ও সঙ্গদোষ ত্যাগ করে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার যোগে স্থিত হয়ে কর্ম কর। কি কর্ম? নিষ্কাম কর্ম কর। **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'**- এই সমত্ব ভাবকেই যোগ বলা হয়। যার মধ্যে বৈষম্য নেই, এইরূপ ভাবকেই সমত্ব বলে। ঋদ্ধি-সিদ্ধিই বৈষম্য উৎপন্ন করে, আসক্তি আমাদের জন্য বিষম অবস্থার সৃষ্টি করে, ফলের ইচ্ছা বৈষম্যের সৃষ্টি করে সেইজন্য ফলের আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে পুনশ্চ কর্মেও যেন অশ্রদ্ধা না হয়। দৃশ্য-শ্রব্য সকল বস্তুর আসক্তি ত্যাগ করে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির বিষয়ে চিন্তন না করে যোগে স্থিত থেকে শুধু কর্ম কর। যোগ থেকে চিত্ত সরে যেন না যায়।

যোগ হল পরাকাষ্ঠার এক স্থিতি-বিশেষ এবং এর শুরুর কোন এক অবস্থাও হয়। শুরুতেও আমাদের দৃষ্টি লক্ষ্যের উপরই থাকা উচিত। অতএব যোগের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। সমত্বভাব অর্থাৎ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান ভাবকেই যোগ বলে। যাঁকে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি বিচলিত করতে পারে না, যাঁর মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় না, এইরূপ ভাবের জন্য একে সমত্ব যোগ বলা হয়। এই সমতা ইষ্ট প্রদান করে থাকেন, সেইজন্য একে সমত্বযোগ বলে। সম্পূর্ণ কামনার ত্যাগের জন্য একে নিষ্কাম কর্মযোগও বলে। কর্ম করতে হবে, সেইজন্য একে কর্মযোগ বলে। পরমাত্মার সঙ্গে মিলন করায় তাই এর নাম যোগ অর্থাৎ মিল। এখানে বৌদ্ধিক স্তরে খেয়াল রাখতে হয় যে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যেন সমভাব থাকে, আসক্তি উৎপন্ন না হয়, ফলের বাসনাও উদয় না হয়, সেইজন্য এই নিষ্কাম কর্মযোগকে বুদ্ধিযোগও বলা হয়।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।। ৪৯।।

ধনঞ্জয়! '**অবরং কর্ম**'- নিকৃষ্ট কর্ম, সকাম কর্ম বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা নিতান্ত তুচ্ছ। যারা ফলের কামনা করে, তারা কৃপণ। তারা আত্মার সঙ্গে উদার ব্যবহার করে না, অতএব সমত্ব বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। মনে যে কামনা আছে তা যদি পূরণও হয়, তাহলেও তা ভোগ করবার জন্য দেহ ধারণ করতে হবে। যদি গমনাগমন বাকী থাকল, তাহলে কিরূপ কল্যাণ? সাধককে মোক্ষের ইচ্ছাও করা উচিত নয়, কারণ বাসনামুক্ত হওয়াকেই মোক্ষ বলে। ফলের চিন্তন করলে সাধকের সময় ব্যর্থই নষ্ট হয় এবং ফললাভ হলে ফলেতেই জড়িয়ে পড়েন। তাঁর সাধনা শেষ হয়ে যায়। এর পর সাধক ভজন করবেন কেন? সেখান থেকেই তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। সেইজন্য সমত্ববুদ্ধির দ্বারা যোগের আচরণ কর।

জ্ঞানমার্গকেও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিযোগ বলেছিলেন যে, "অর্জুন! এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে" এবং এখানে নিষ্কাম কর্মযোগকেও বুদ্ধিযোগ বলা হল। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুদ্ধির ও দৃষ্টিকোণেরই। তাতে লাভ-লোকসানের হিসাব করে, বিবেচনা করে চলতে হয়। এতেও বৌদ্ধিক স্তরে সমত্ব স্থিতি বজায় রাখতে হয়। সেইজন্য একে সমত্ব বুদ্ধিযোগ বলে। তাই হে ধনঞ্জয়! তুমি সমত্ব বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষী অত্যন্ত কৃপণ।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।। ৫০।।

সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ পুণ্য-পাপ উভয়কে ইহলোকেই ত্যাগ করেন অর্থাৎ পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হন না, সেইজন্য সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগের অনুষ্ঠান কর। **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'**- সমত্ব বুদ্ধির সংযোগে আচরণে কুশলতাই যোগ।

সংসারে কর্ম করবার প্রচলিত দৃষ্টিকোণ দুটি। লোকে কর্ম করে, তাই তারা ফলও পেতে চায় অথবা ফললাভ না হলে কর্ম করতেই চায় না; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কর্মকে বন্ধনের কারণ বলেছেন। 'আরাধনা'কেই একমাত্র কর্ম বলেছেন। বর্তমান অধ্যায়ে তিনি কর্মের নাম মাত্র নিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে তার পরিভাষা দিয়েছেন ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মের স্বরূপের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। প্রস্তুত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিক পরম্পরা থেকে সরে কর্ম করবার কৌশল সম্বন্ধে বলেছেন যে, কর্ম কর, শ্রদ্ধাপূর্বক কর; কিন্তু ফলের অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ কর। ফল যাবে কোথায়? একেই কর্ম করবার কুশলতা বলে। নিষ্কাম সাধকের সমগ্র শক্তি এই প্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকে। আরাধনার জন্যই এই দেহ ধারণ। তবু এই জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক যে, তবে কি সর্বদাই কর্ম করে যেতে হবে অথবা এর পরিণামও দেখা যাবে? পরবর্তী শ্লোকটি দেখুন–

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।। ৫১।।

বুদ্ধিযোগযুক্ত জ্ঞানীগণ কর্মজাত ফলত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন। তাঁরা নির্দোষ অমৃতময় পরমপদ লাভ করেন।

এখানে তিন ধরণের বুদ্ধির চিত্রণ করা হয়েছে। (শ্লোক ৩১) সাংখ্য বুদ্ধিতে ফল দুটি স্বর্গ এবং শ্রেয়। (শ্লোক ৫১) কর্মযোগে প্রবৃত্ত বুদ্ধির ফল একটাই–জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি, নির্মল অবিনাশী পদলাভ। দুটিই হল যোগক্রিয়া। এর অতিরিক্ত যে বুদ্ধি সেটি অবিবেকজন্য, অনন্ত শাখাযুক্ত, যার ফল হ'ল কর্মভোগের জন্য বারম্বার জন্ম-মৃত্যু।

অর্জুনের দৃষ্টি ত্রিলোকের সাম্রাজ্য এবং দেবগণের অধিপতি পদপর্যন্ত সীমিত ছিল। এতটা লাভের জন্যও তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছিলেন না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

প্রতি নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করলেন যে, আসক্তিশূণ্য কর্মদ্বারা অনাময় পদলাভ হয়। নিষ্কাম কর্মযোগ পরমপদ লাভে সাহায্য করে, যেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নেই। এই কর্মে কখন প্রবৃত্তি হবে?—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ।। ৫২।।

যখন তোমার (প্রত্যেক সাধকের) বুদ্ধি মোহরুপ কর্দম অতিক্রম করবে, লেশমাত্রও মোহ থাকবে না অর্থাৎ পুত্র, ধন, প্রতিষ্ঠা এগুলির সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তা ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন যা শ্রবণযোগ্য তা তুমি শুনতে পাবে এবং শোনার ফলস্বরূপ বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে অর্থাৎ তা আচরণ করতে সমর্থ হবে। এখন যা শ্রবণযোগ্য, তা তুমি শোননি, তাই আচরণের প্রশ্নই ওঠে না। এই যোগ্যতার উপর পুনরায় আলোকপাত করলেন—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।। ৫৩।।

নানা বেদবাক্য শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাত্মস্বরূপে সমাধিস্থ হয়ে অচল, স্থির হবে, তখন তুমি সমত্বযোগ লাভ করবে। পূর্ণ সমস্থিতি লাভ করবে, যাকে 'অনাময় পরমপদ' বলে। এই হল যোগের পরাকাষ্ঠা এবং অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি। বেদ থেকে শিক্ষা অর্জন করা হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, '**শ্রুতিবিপ্রতিপন্না**'- শ্রুতিগুলির নানা সিদ্ধান্ত শ্রবণে বুদ্ধি বিচলিত হয়। লোকে নানা সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে থাকে, কিন্তু যা শ্রবণেযোগ্য তার থেকে তফাতেই থাকে।

যখন এই বিচলিত বুদ্ধি সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি যোগের পরাকাষ্ঠা অমৃত পদলাভ করবে। একথা শোনার পর অর্জুনের উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক ছিল যে, সেই মহাপুরুষগণ কেমন হন, যাঁরা অনাময় পরমপদে স্থিত, সমাধিতে যাঁদের বুদ্ধি স্থির? তিনি প্রশ্ন করলেন—

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।। ৫৪।।

"সমাধীয়তে চিত্তং যস্মিন্ স আত্মা এব সমাধিঃ" অর্থাৎ যাতে চিত্তের সমাধান করা হয়, সেই আত্মাই হ'ল সমাধি। যিনি অনাদি তত্ত্বের সমতুল্য অবস্থা লাভ করে থাকেন, তাঁকেই সমাধিস্থ বলে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে কেশব! সমাধিতে স্থিত, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন মহাপুরুষের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কিভাবে কথা বলেন? কিরূপে অবস্থান করেন? কিরূপেই বা তিনি বিচরণ করেন? অর্জুন চারটি প্রশ্ন করলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ব্যক্ত করে বললেন-

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। ৫৫।।

পার্থ! যখন মানুষ সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি আত্মাদ্বারাই আত্মাতে সন্তুষ্ট হন ও তাঁকে তখন স্থিরবুদ্ধিযুক্ত বলা হয়। কামনাগুলি ত্যাগ করলেই আত্মার দিগ্দর্শন হয়। এইরূপ আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। ৫৬।।

দৈহিক, দৈবিক এবং ভৌতিক দুঃখে যাঁর মন উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ, যাঁর আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধনাশ হয়েছে, মননশীলতার চরমসীমায় যিনি পৌঁছেছেন, তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৫৭।।

যে পুরুষ সর্বত্র স্নেহবর্জিত, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দিত বা দুঃখিত হন না, তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়েছে। শুভ পরমাত্ম-স্বরূপ-এ সংযোগ করে এবং অশুভ প্রকৃতিতে প্রলুব্ধ করে রাখে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অনুকূল পরিস্থিতিতে আনন্দিত হন না এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখিত হন না; কারণ প্রাপ্তযোগ্য বস্তু তাঁর থেকে ভিন্ন নেই এবং সেই বিকারগুলিও নেই, যেগুলি পতিত করে দেয় অর্থাৎ তখন তাঁর সাধনার প্রয়োজন থাকে না। এরূপ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮।।

যেমন কচ্ছপ নিজ অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ এই পুরুষ যখন চারদিক্ থেকে নিজ ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়। বিপদের সম্মুখীন হলেই কচ্ছপ যেমন নিজের মাথা-পা সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যে পুরুষ বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্বক বিষয় থেকে আকর্ষণ করে হৃদয়-দেশে নিরুদ্ধ করেন, সেইকালে সেই পুরুষের বুদ্ধি স্থির হয়; কিন্তু এটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। বিপদ দূর হলেই কচ্ছপ নিজ অঙ্গসমূহ পুনরায় প্রসারিত করে, স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষও কি সেই প্রকার বিষয়ে রস নিতে আরম্ভ করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।। ৫৯।।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পুরুষগণ বিষয়ভোগ গ্রহণ করেন না, তাঁরা বিষয় থেকে নিবৃত্ত হন, কারণ তাঁরা গ্রহণ করেন না; কিন্তু তাঁদের আসক্তি দূর হয় না। আসক্তি রয়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করেন যে নিষ্কামকর্মীগণ তাঁদের আসক্তি '**পরং দৃষ্ট্বা**'- পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে নিবৃত্ত হয়।

মহাপুরুষ কচ্ছপের মত নিজের ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ে লিপ্ত করেন না। ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় থেকে নিবৃত্ত হলে সংস্কার লুপ্ত হয়ে যায়। এদের আত্মপ্রকাশ ঘটে না। নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ করে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষের বিষয়াসক্তি দূর হয়। চিন্তন পথে প্রায়ই হঠকারিতা দেখা যায়। দৃঢ় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করে নিবৃত্ত হয়ে যান, কিন্তু মনে আসক্তি ও বিষয়-চিন্তন লেগেই থাকে। এই আসক্তি 'পরং দৃষ্ট্বা'-পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলেই দূর হয়, তার আগে নয়।

পূজ্য মহারাজজী এই সম্বন্ধে নিজের জীবনের একটি ঘটনা বলতেন। গৃহত্যাগের পূর্বে তাঁর প্রতি তিনবার আকাশবাণী হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম– "মহারাজজী! আপনার প্রতি আকাশবাণী কেন হয়েছিল? আমাদের প্রতি তো হয়নি।" তখন মহারাজজী বলেছিলেন– "হো! ই শঙ্কা মোহুঁকে ভই রহী।" অর্থাৎ এই সন্দেহ আমারও হয়েছিল। তখন অনুভব হল যে, আমি গত সাত জন্ম

থেকে সাধু। চার জন্ম কেবল সাধুর বেশে তিলক কেটে, ভস্ম মেখে, কোথাও কমণ্ডলু নিয়ে বিচরণ করেছি। যোগক্রিয়ার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু গত তিনজন্ম ধরে যেমন হওয়া উচিত, তেমনি সাধু ছিলাম। আমার অন্তরে যোগক্রিয়া জাগ্রত ছিল। পূর্ব জন্মেই নিবৃত্তি হয়ে এসেছিল, কিন্তু দুটি ইচ্ছা বাকী ছিল, স্ত্রী ও গাঁজা। অন্তর্মনে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাইরে থেকে আমি শরীরকে দৃঢ় রেখেছিলাম। মনে বাসনা ছিল, তাই জন্ম নিতে হয়েছে। জন্মের পর অল্প সময়ের মধ্যেই ভগবান্ সবকিছু দেখিয়ে-শুনিয়ে নিবৃত্তি প্রদান করেছেন। দুই-তিন তুড়ি দিয়েই সাধু বানিয়ে দিয়েছেন।

এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যিনি বিষয় গ্রহণ করেন না, সেই পুরুষেরও বিষয় থেকে নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সাধনা করে পরমপুরুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে বিষয়গুলির আসক্তিও চলে যায়। অতএব সাক্ষাৎকার যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ কর্ম করা উচিত।

উর কছু প্রথম বাসনা রহী। প্রভুপদ প্রীতি সরিত সো বহী।।

(রামচরিতমানস, ৫/৪৮/৬)

ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। এর উপর আলোকপাত করলেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।। ৬০।।

কৌন্তেয়! প্রমথনশীল ইন্দ্রিয়সমূহ যত্নশীল মেধাবী পুরুষের মনকে বলপূর্বক হরণ করে, বিচলিত করে দেয়। সেইজন্য—

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীৎ মৎপরঃ।

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৬১।।

সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে, যোগযুক্ত এবং সমর্পণের সঙ্গে আমার আশ্রয়ে এস; কারণ যাঁর ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়েছে তাঁরই বুদ্ধি স্থির হয়। এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সাধনের নিষেধাত্মক অবয়বগুলির সঙ্গে তার বিধেয়াত্মক দিকের উপর জোর দিলেন। কেবল সংযম ও নিষেধদ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়

না। সমর্পণের সঙ্গে ইষ্ট-চিন্তন অনিবার্য। ইষ্ট-চিন্তনের অভাবে বিষয়-চিন্তন হবে, যার কুপরিণাম শ্রীকৃষ্ণের শব্দেই দেখুন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।

সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।। ৬২।।

বিষয়সমূহ চিন্তন করতে করতে মানুষের সেই সকলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনা জাগে, কামনা-পূর্তিতে বাধা পেলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে কি হয়?—

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি।। ৬৩।।

ক্রোধ থেকে মূঢ়ভাব অর্থাৎ অবিবেক উৎপন্ন হয়। নিত্য-অনিত্য বস্তুর জ্ঞান থাকে না। অবিবেক থেকে স্মৃতি বিভ্রম হয়। (যেমন অর্জুনের হয়েছিল— **'ভ্রমতীব চ মে মনঃ।'** গীতা সমাপনের সময় তিনি বলেছেন—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' (১৮/৭৩)**। কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, তার নির্ণয় করা যায় না।), স্মৃতিবিভ্রম হলে যোগপরায়ণ বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধি বিনষ্ট হলে এই পুরুষ নিজ শ্রেয-সাধন পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ জোর দিলেন যে, বিষয়ের চিন্তন করা উচিত নয়। সাধকের নাম, রূপ, লীলা ও ধামেই কোথাও না কোথাও মনকে নিযুক্ত রাখা উচিত। ভজনে অলসতা করলে মন বিষয়াভিমুখ হবে। বিষয়ের চিন্তন থেকে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে সেই বিষয়ের কামনা সাধকের অন্তর্মনে জাগে। কামনা পূর্তিতে ব্যবধান উৎপন্ন হলে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে অবিবেক, অবিবেক থেকে স্মৃতি-বিভ্রম এবং স্মৃতি-বিভ্রম থেকে বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। নিষ্কাম কর্মযোগকে বুদ্ধিযোগ বলা হয়। কারণ বুদ্ধিস্তরে এর বিচার করা উচিত যে, কামনাগুলি যেন না জাগে, ফল নেই। কামনা জাগলে এই বুদ্ধিযোগ নষ্ট হয়ে যায়। **'সাধন করিয় বিচারহীন মন শুদ্ধ হোয় নহীঁ তৈসে।' (বিনয়পত্রিকা, পদসংখ্যা ১১৫/৩)** অতএব বিচার আবশ্যক। বিচারশূণ্য পুরুষ শ্রেয়-সাধন থেকে পতিত হয়। সাধন-ক্রম ভঙ্গ হয়, সর্বথা নষ্ট হয় না। যেখানে অবরুদ্ধ হয়েছিল, ভোগের পর সাধন সেইখান থেকেই পুনরায় আরম্ভ হয়।

বিষয়াভিমুখ সাধকের এই গতি হয়। স্বাধীনচেতা সাধক কোন্ গতিলাভ করেন? একে আধার করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।। ৬৪।।

আত্ম-বিধিপ্রাপ্ত প্রত্যক্ষদর্শী মহাপুরুষ রাগ-দ্বেষ মুক্ত হয়ে স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা '**বিষয়ান্ চরন্**'- বিষয়সমূহে বিচরণ করেও '**প্রসাদমধিগচ্ছতি**'- অন্তঃকরণের নির্মলতা লাভ করেন। তিনি নিজের ভাবদৃষ্টিতে অবস্থান করেন। মহাপুরুষের জন্য বিধি-নিষেধ থাকে না। তাঁরজন্য অশুভ বলে কিছু থাকে না, যার থেকে তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে চলবেন এবং শুভ বলেও কিছু থাকে না, যা তিনি কামনা করবেন।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।। ৬৫।।

ভগবানের পূর্ণ কৃপাপ্রসাদ 'ভগবত্তা'র সঙ্গে সংযুক্ত হলে সেই পুরুষের সর্বদুঃখের অভাব হয়, '**দুঃখালয়ং অশাশ্বতম্**' **(গীতা, ৮/১৫)** সংসারের অভাব হয় এবং সেই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি শীঘ্রই উত্তমরূপে স্থির হয়। কিন্তু যিনি যোগযুক্ত নন, তাঁর অবস্থার কথা বলবার প্রসঙ্গে—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।। ৬৬।।

যোগ-সাধনাশূণ্য পুরুষের অন্তঃকরণে সকাম বুদ্ধি থাকে। ঐ অযুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভাবও হয় না। ভাববিহীন পুরুষের শান্তি কোথায়? এইরূপ অশান্ত পুরুষের সুখ কোথায়? যোগ-ক্রিয়ার আচরণ করবার পর কিছু অনুভব হলেই ভাব জন্মায়। '**জানে বিনু ন হোই পরতীতি।**' **(মানস, ৭/৮৮-খ/৭)** ভাবনা হলে শান্তি হয় না এবং অশান্ত পুরুষের সুখ অর্থাৎ শাশ্বত, সনাতনের প্রাপ্তি হয় না।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।। ৬৭।।

বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে বলপূর্বক গন্তব্য স্থান থেকে দূরে নিয়ে যায়, সেইরূপ বিষয়সমূহে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে, যে ইন্দ্রিয়টিকে মন অনুসরণ করে, সেই একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ই ঐ অযুক্ত পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে। অতএব যোগের আচরণ অনিবার্য। ক্রিয়াত্মক আচরণের উপর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জোর দিলেন–

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৬৮।।

হে মহাবাহো! সেইজন্য যে পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, তাঁর বুদ্ধিই স্থির হয়। 'বাহু' কার্যক্ষেত্রের প্রতীক। ভগবানকে 'মহাবাহু' এবং 'আজানুবাহু' বলা হয়। তিনি হাত-পা ব্যতীত সর্বত্র কার্য করেন। তাতে যিনি স্থিতি লাভ করেন অথবা যিনি সেই ভগবত্তার দিকে অগ্রসর, তিনিও মহাবাহু। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই মহাবাহু।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।। ৬৯।।

সর্বভূতের পক্ষে পরমাত্মা রাত্রিস্বরূপ; কারণ তিনি দৃশ্যমান নন, বিচারের অধীন নন, তাই রাত্রি স্বরূপ। সেই রাত্রিতে, পরমাত্মাতে স্থিত সংযমী পুরুষ উত্তমরূপে দেখেন, বিচরণ করেন, জাগ্রত থাকেন; কারণ সেখানে তাঁর প্রবেশ আছে। যোগী ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমের দ্বারা তাঁতে স্থিতি লাভ করেন। যে বিনাশশীল সাংসারিক সুখ-ভোগের জন্য ভূতগণ দিন-রাত পরিশ্রম করে, যোগীর পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ।

রমা বিলাসু রাম অনুরাগী। তজত বমন জিমি জন বড়ভাগী।।
(রামচরিতমানস, ২/৩২৩/৮)

যিনি যোগী পরমার্থ পথে নিরন্তর সজাগ এবং ভৌতিক ইচ্ছা থেকে সর্বথা মুক্ত, তিনিই ইষ্টে প্রবেশ লাভ করেন। তিনি এই সংসারেই থাকেন; কিন্তু তাঁর উপর সংসারের কোন প্রভাব পড়ে না। মহাপুরুষ কিভাবে অবস্থান করেন, এখানে তারই বর্ণনা করা হয়েছে–

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।৭০।।

যেমন পরিপূর্ণ অচল প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রে নদীগুলি প্রচণ্ড বেগে প্রবেশ করে, তাতে লীন হয়ে আত্মহারা হয়ে যায়, সেইরূপ পরমাত্মাতে স্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের মনে ভোগগুলি কোন বিকার উৎপন্ন না করে তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এরূপ পুরুষ পরমশান্তি লাভ করেন। কিন্তু যিনি বিষয় কামনা করেন, তাঁর পক্ষে শান্তি লাভ অসম্ভব।

ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত নদীগুলির স্রোত ফসল নষ্ট করে, প্রাণীদের হত্যা করে, নগর প্লাবন, হাহাকারের সৃষ্টি করে প্রচণ্ডবেগে সমুদ্রে মিলিত হয়; কিন্তু সমুদ্রে বিক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাতেই সমাহিত হয়। সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের প্রতি বিষয়ভোগ ততটা বেগেই আসে কিন্তু সমাহিত হয়ে যায়। ঐ মহাপুরুষের অন্তরে শুভ অথবা অশুভ কোন সংস্কার উৎপন্ন করতে পারে না। যোগীর কর্ম 'অশুক্ল' ও 'অকৃষ্ণ' হয়। কেননা যে চিত্তে সংস্কার উৎপন্ন হত, তা নিরুদ্ধ এবং বিলীন হয়ে গেছে। এর সঙ্গেই ভগবত্তার স্থিতিলাভ হয়েছে। এখন সংস্কার জন্মাবে কোথায়? এই একটি শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কয়েকটাই জিজ্ঞাসার সমাধান করে দিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল যে, স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ কি? কিভাবে কথা বলেন, অবস্থান করেন, বিচরণ করেন? শ্রীকৃষ্ণ একটা বাক্যেই উত্তর দিলেন যে, তিনি সমুদ্রবৎ হন। তাঁরজন্য বিধি-নিষেধ হয় না যে, এইভাবে বস, চল। তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন, কারণ তিনি সংযমী। ভোগাকাঙ্ক্ষী শান্তি পান না। এর উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে–

বিহায় কামান্যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।৭১।।

যে পুরুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করে '**নির্মমঃ**'- আমি ও আমার এই ভাব এবং অহঙ্কাররহিত এবং স্পৃহাশূণ্য হয়ে পর্যটন করেন, তিনি পরমশান্তি লাভ করেন, যারপর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।।৭২।।

হে পার্থ! উপর্যুক্ত অবস্থাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের স্থিতি। সমুদ্রবৎ সেই মহাপুরুষে বিষয়সমূহ নদীগুলির মতো বিলীন হয়ে যায়। তিনি পূর্ণ সংযমী এবং প্রত্যক্ষতঃ পরমাত্মদর্শী হন। কেবল 'অহং ব্রহ্মাস্মি' পড়ে নিলে বা কণ্ঠস্থ করে নিলেই এই স্থিতি লাভ হয় না। সাধন করলে তবেই লাভ হয়। এরূপ মহাপুরুষ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে স্থিত থেকে অন্তিম সময়েও ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

নিষ্কর্ষ –

প্রায়ই লোকে বলে যে, দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতাশাস্ত্র পূর্ণ হয়, কিন্তু যদি কেবল কর্মের নামমাত্র নিলেই কর্ম পূর্ণ হয়ে যেত, তাহলে এখানেই গীতার সমাপন ভাবা হত। বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে– অর্জুন! নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন, যা জেনে তুমি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কর্ম করাতে তোমার অধিকার আছে, কর্মফলে নেই, আবার সেই কর্ম করবার সময় তোমার অশ্রদ্ধাও যেন উৎপন্ন না হয়, নিরন্তর করবার জন্য তৎপর হও। এর পরিণামস্বরূপ তুমি '**পরং দৃষ্ট্বা**' (২/৫৯)– পরমপুরুষের দর্শন করে স্থিতপ্রজ্ঞ হবে, পরমশান্তি লাভ করবে। কিন্তু একথা বললেন না কর্ম কি?

এটি 'সাংখ্যযোগ' নামক অধ্যায় নয়। এই নাম টীকাকারের দেওয়া, শাস্ত্রকার দেননি। তাঁরা নিজের বুদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করেন, তাতে আশ্চর্য কি?

বর্তমান অধ্যায়ে কর্মের গৌরব, করবার সময় সাবধানতার অবলম্বন এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ প্রভৃতি বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনে কর্মের প্রতি উৎকণ্ঠা জাগিয়েছিলেন। তাঁর মনে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করেছিলেন। আত্মা শাশ্বত, সনাতন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করে তত্ত্বদর্শী হও। এর প্রাপ্তির পথ দুটি–জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্মযোগ।

নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী, স্বয়ং লাভ-লোকসানের নির্ণয় করে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া জ্ঞানমার্গ এবং ইষ্টের উপর নির্ভর করে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সেই কর্মেই প্রবৃত্ত হওয়াকে নিষ্কাম কর্মমার্গ অথবা ভক্তিমার্গ বলে। গোস্বামী তুলসীদাসজী উভয়ের বর্ণনা এইভাবে করেছেন–

মোরে প্রৌঢ় তনয় সম গ্যানী। বালক সুত সম দাস অমানী।।
জনহি মোর বল নিজ বল তাহী। দুহু কহঁ কাম ক্রোধ রিপু আহী।।

(রামচরিতমানস, ৩/৪২/৮-৯)

আমার ভজনাকারী দুই প্রকারের—একটি জ্ঞানমার্গী, অন্যটি ভক্তিমার্গী। নিষ্কাম কর্মমার্গী অথবা ভক্তিমার্গী শরণাগত হয়ে, আমার আশ্রয় নিয়ে চলেন, জ্ঞানযোগী নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে, নিজের লাভ-লোকসান বিচার করে নিজের উপর নির্ভর করে চলেন, যদিও উভয়েরই শত্রু এক। জ্ঞানমার্গীকে কাম-ক্রোধাদি শত্রুদের দমন করতে হয় এবং নিষ্কাম কর্মযোগীকেও এদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হয়। উভয়েই কামনা-ত্যাগ করেন এবং উভয় মার্গেই যে কর্ম করা হয় তা'এক। "এই কর্মের পরিণাম পরমশান্তি লাভ করবে।" কিন্তু কর্ম কি? বলা হয়নি। এখন আপনার মনেও এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে নিশ্চয় যে, কর্ম কি? অর্জুনের মনেও কর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেই তিনি কর্মবিষয়ক প্রশ্ন করেছেন। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসূ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'কর্মজিজ্ঞাসা' নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।।২।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদে 'কর্মজিজ্ঞাসা' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'কর্মজিজ্ঞাসা' নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।।২।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'কর্মজিজ্ঞাসা' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।